রণাঙ্গনের সাথীরা

মখদুম আজম মাশরাফী

গেল বছর দেশে আমার পৈত্রিক ভূমি উত্তর বাংলার শেষ প্রান্ত ডোমারে বিজয় দিবস উদযাপনের সুযোগ হয়েছিল। ৩৫ বছর পর রণাঙ্গনের সাথীদের সাথে এই দিনটি পালনের যে অনুভূতি তা প্রকাশের প্রয়োজনীয় ভাষা কারো নেই। বেশ ক'বার আমি দু'বছর পর পর দেশে গিয়েছি কিন্তু সবাইকে এইদিনটিতে একসঙ্গে পাওয়ার সুযোগ ছিল না। কারো কারো সাথে কখনও সখনও দেখা হয়ে যেতো হাটে বাজারে। খুবই সংক্ষিপ্ত আবেগভরা সে সাক্ষাতটুকু আলোড়িত করতো উভয়কে।

যা হোক, উপজেলা প্রাঙ্গন সাজানো হয়েছিল সামিয়ানায়। প্রত্যন্ত পৌর উপজেলা ডোমারে এ রকম সাজসজ্জা দিনবদলের জানান দিচ্ছিল আমাকে। পাশেই আমার বাল্য ও কৈশোরের স্কুল ও মাঠ। আমার প্রিয় কিছু সে সময়কালের শিক্ষকও এসেছেন অনুষ্ঠানে। স্কাউট শিক্ষক চির সবুজ ইউনুস স্যার এসে কোলাকুলি করলেন। মেহেদী রাঙ্গা দাঁড়ী তাঁর স্বাস্থোজ্জ্বল অবয়বকে আড়াল করতে পারেনি। তিনি আজকের ক্রীড়ানুষ্ঠান পরিচালনা করছেন, যেমনটি তিনি সবসময়ই করেছেন। টি. এন. ও নতুন প্রজন্মের এক বিনয়ী তরুণ। তার পাশে বসে আছেন সুফিয়ান স্যার। হ্যান্ডসাম স্যারের শুভ্রকেশ ছাড়া বাকী সবই অটুট আছে। যেমন আছে আমার প্রতি তাঁর স্বভাবসূলভ স্নেহ-আদর। মাঠে পৌছাতেই আমিনার এসে নিয়ে বসালো প্রথম সারির আসনে। ইলিয়াস, মোস্তফা ভাই, মানিকদা খুশী হলো খুব। পেছনের সারিতে দেখলাম সেলিম আর বাকী সব মুক্তিযোদ্ধা। প্রবাসে প্রায় দু'টি দশক কাটালেও মায়ার বাঁধন যেন অটুট আছে তা আনন্দিত করলো আমাকে।

মাঝে লাল টকটকে সূর্য্য খচিত গাঢ় সবুজ পতাকা হাতে শিশু ও কিশোরকিশোরীদের শরীরচর্চা প্রদর্শনীর মুগ্ধকর পরিবেশনার রৌদ্রময় শীত সকাল হয়ে উঠলো অবর্ণনীয়। খুব গভীর অন্তরে অনুভূত হল আমাদেও কষ্টময় মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিময় গৌরব। তার অর্জনের স্বপ্ন-সাফল্যের আবেগ আমাকে তীব্রভাবে আলোড়িত করলো।

মুক্তিযুদ্ধের জন্যে ক্রীড়া প্রতিযোগীতার মধ্যে ছিল লৌহ গোলক নিক্ষেপ, আর মনোজ্ঞ ফুটবল (সরকারী কর্মচারী বনাম আমরা) প্রতিযোগিতা। আরও আনন্দ নিয়ে এলো যখন আমি লৌহগোলক নিক্ষেপে প্রথম হলাম। আমার চেয়ে যেন আমার সহযোদ্ধাদের আনন্দ হলো বেশী।

দুপুরে মুক্তিযোদ্ধা সংসদে স্মৃতিচারন নয়, খুব সংক্ষিপ্ত সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান হল উপজেলা কর্তৃপক্ষ থেকে। দুপুরের খাবার আর একটি করে লুঙ্গি উপহার দিয়ে সম্বর্ধিত হল এক কালের উৎক্ষিপ্ত নক্ষত্রের পুঞ্জ। সামিয়ানার নীচে প্লাষ্টিক চেয়ারগুলিতে বসে ছিলেন প্রায় ১৫০ জন মুক্তিযোদ্ধা।

৩৫ বছর পর এ এক ভিন্ন দৃশ্য। পক্ককেশ, প্রৌঢ়ত্বের ভারে ভারাক্রান্ত জীবনযুদ্ধে পরাজিত এই সব মুখ যেন নির্বাক, মুক। এরা ক্রমশঃ কমছেন সংখ্যায়। সম্প্রতি এ এলাকার প্রায় ১৩ জন মুক্তিযোদ্ধা প্রয়াত হয়েছেন।

নিম্নমানের কার্ডবোর্ডের বাক্সের ভেতর পলিথিনের ব্যাগে ভাত, গোস্তের দু'এক টুকরো, আধা অংশ ডিম এই ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে হাতে করে খাওয়ার দুপুরের খাবার, কোন টেবিল ছিল না। পুরোনো দালানের অপরিসর বারান্দায় গাদাগাদি করে বসানো একটি টেবিলে বসে খেলেন টি. এন. ও. , পুলিশ সি. আই ও কিছু নির্ধারিত ব্যক্তি আর ভাষন দিলেন। এদের প্রায় সবাই মুক্তিযোদ্ধা নন।আমি জানি এবং শুনেছিও নানান বিতর্কের কথা স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠন নিয়ে । যার সব কিছুই চিরপুরাতন সংকীর্ণতায় আড়ষ্ট দুঃখজনক বিভিন্ন বিষয়। অনেক অন্তরঙ্গ সহযোদ্ধাদের এখানে না দেখে তাই অবাক হয়নি।

বিকেলে ছিল উপজেলা কর্তৃপক্ষের আয়োজিত আলোচনা সভা, পুরষ্কার বিতরনী অনুষ্ঠান সেই একই প্রাঙ্গনে। মানিকদা তার আবেগভরা ক্ষোভের কথা বললেন মুক্তিযোদ্ধা সম্বর্ধনার অসংলগ্নতার কথা ব্যাখ্যা করে। মুক্তিযোদ্ধাদের সম্বর্ধনা দেয়ার কথা সরকারী বা বেসরকারী যে কোন পক্ষ থেকে। অন্ততঃ মুক্তিযোদ্ধাদের নিজ পক্ষ থেকে নিজেকে সম্বর্ধনা দেয়ার কথা নয়। আমিনার তীব্রক্ষোভে ব্যক্ত করলো নিজের অনুভূতি। বর্তমান কমান্ডার জব্বার বললেন সমালোচনার উত্তরে অনেক কিছুর দায় মেনে নিয়ে। কিন্তু এসবই এক ধরনের হাস্যকর অবস্থায় পৌছার পর মাত্র। আমাকে বলার সুযোগ দিয়ে সম্মানিত করেছিল সবাই। আমি ধন্য বোধ করেছি, আবার অধিকারও বোধ করেছি, বলতে দ্বিধা নেই। হত দরীদ্র, রোগ ক্লিষ্ট, শিক্ষাহীন এই মানুষগুলোর ভালবাসার আসলে কোন তুলনা নেই। আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম তাদের প্রায় সবাই সে সময় রাজনীতিবিদ ছিলাম না। প্রকৃতপক্ষে প্রায় সব তথাকথিত রাজনীতিকরা সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনের কৃতি রাজনীতিবিদরাও অপসারিত হয়েছিলেন স্বয়ং বঙ্গবন্ধুর দ্বারাই। বঙ্গবন্ধু ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের হাজার মাইলের দুরত্বে। সম্পর্কহীন, সংযোগ বিচ্ছিন্ন বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধকে আরও ব্যর্থ করেছিলেন মুক্তিযুদ্ধ সংগঠক শীর্ষস্থানীয় সকল নের্তৃবর্গকে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শীর্ষ নেতৃবর্গ দ্বারা প্রতিস্থাপিত করে। বন্ধুদেশ ভারত তার নিজস্ব রাজনৈতিক কারণে আমাদের যে অপরিসীম সহায়তা করেছেন তার তুলনা নেই। কারণ তৎকালীন বিশ্বরাজনীতিতে মার্কিনদেশ আর চীনের ভূমিকার প্রতিপক্ষে ভারতের মাধ্যমে সোভিয়েত দেশের সরাসরি অংশগ্রহন ছাড়া গণহত্যা, গণতন্ত্র হত্যা ও বাঙ্গালী জাতিকে অকেজো করে দেয়ার হীন প্রচেষ্টাকে রুখে দেয়া যেতো না।

যা হোক রণাঙ্গনের বিজয়ের পর আমরা রাজনীতিবিদদের হাতে তুলে দিয়েছিলাম আমাদের অর্জিত স্বাধীনতা, ভূখন্ড ও পতাকা । ত্যাগ ও স্বপ্নদিয়ে গড়া এর সুফল পাবে প্রতিটি বাঙ্গালী এই ছিল আশা ও প্রার্থনা। নেতার জন্যে এদেশের মানুষের মমতার কোন তুলনা নেই। নামাজ রোজার, পুজায়-প্রার্থনায় নেতাদের প্রতি যে বিশ্বাস ও আস্থা বাঙ্গালী ও তাঁদের সন্তান মুক্তিযোদ্ধারা স্হাপন করেছিলেন তা অবিস্বরণীয়।

১৯৭২-৭৩ সালে ঢাকা কলেজের ছাত্র থাকাকালে অদ্য স্বাধীনদেশের 'স্বশাসনের' অনেক ঘটনা মনে আছে। থাকতাম ক্যাম্পাসের দক্ষিণ ছাত্রাবাসে। কি করে ভূলবো 'এক নেতা একদেশের' দুঃশাসনের ইতিহাস। স্বাধীনতার সেই প্রভাত বেলায় 'অরুনোদয়ের অগ্নিস্বাক্ষী' হতে চেয়ে পারিনি। কারণ সে ছিল ব্যর্থ অরুনোদয়। অগ্নিকান্ড হয়েছিল বৈকি। তার স্বাক্ষী আমার মত অনেক বাঙ্গালী, অনেক মুক্তিযোদ্ধা। স্বাধীনতা পুর্ববর্তী রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ ছিলাম বলেই স্বাধীনতা যুদ্ধের সর্বোচ্চ ঝুঁকি নিতে দ্বিধা করিনি। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর সরাসরি রাজনীতি করিনি কখনও, যুদ্ধের আগে কিংবা পরে। বঙ্গবন্ধুর যাদুকরি ব্যক্তিত্ব চিরকালই আপ্লুত করেছে আমার রাজনৈতিকবোধ। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে তাঁর সীমাহীন প্রশাসনিক ব্যর্থতার চরম মূল্য তিনি শুধু নিজ পরিবারেই দেননি, মূল্য দিতে হয়েছে একটি যুদ্ধ বিজয়ী জাতির সবাইকে। যা এখনও যথার্থে বিবেচিত হয়নি। এই ১৯৭২-৭৫ ছিল এক অস্থির সময়কাল। জাতির পিতা ও দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতায় আসীন ব্যক্তির ছেলে খোলা জীপে, বেশ ক'জন সঙ্গী নিয়ে অস্ত্র হাতে দাপিয়ে বেড়াতো বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা। যথেচছা মারধোর আর নিপীড়ন চালাতো যে কোন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে। আইন, প্রশাসন, মোরালিটি সব কিছুর উর্দ্ধে এই সন্ত্রাসী আচরণ আতংকিত করে তোলে সারা দেশকে। অন্তর্দলীয় কোন্দলে সূর্য্যসেন হলে এক রাতেই নৃশংসভাবে গুলি করে হত্যা করা হয় ১০ জনেরও বেশী ছাএকে। নিজের চোখেই এসব দেখেছি। ঢাকা হয়ে ওঠে হত্যা, হাইজাক, ডাকাতী কালচারের রাজধানী। সাপ্তাহিক বিচিত্রা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশ্ন করে, ' -- আপনি কি হাইজাকার, ডাকাত? আপনি কি অপরাধী? আত্মপক্ষ সমর্থন করুন।' জনগণের এই শত প্রশ্নের জবাবে অনেক মুক্তিযোদ্ধা আত্মপক্ষ সমর্থন করে লিখেছিলেন সেদিন বিচিত্রার পাতায়। আমিও লিখেছিলাম-- "আমরা বিস্মিত হয়েছি এক লক্ষ মুক্তিযোদ্ধার স্থানে কয়েকলক্ষ মুক্তিযোদ্ধার জারজ সংখ্যাধিক্য দেখে।" আরও লিখেছিলাম, 'মুক্তিযোদ্ধারা ৩০% অগ্রাধিকারের প্রশ্ন তুললে গলধাক্কা পেয়েছে।' লিখেছিলাম "এই ন্যায়নীতিহীন সমাজে

ন্যায়নীতি বিচ্যুত হওয়া বিছুমাত্র অসম্ভব নয়।' লিখতে বাধ্য হয়েছিলাম -- "এই মুহুর্তে বিলুপ্ত হোক এই সমাজের অযোগ্য ধ্বজাধারীরা।"

তারপর ইতিহাসের অনিবার্য্য পথ ধরে এসেছিল নিষ্ঠুর বিপর্য্যয়। একদলীয় শাসন ও গনতন্ত্র বিবর্জিত রাজনীতির ইতিহাস আর তাকে অনুসরণ করে ব্যারাকের সেপাইদের বন্দুকের নলে ক্ষমতায়নের আর ভন্ড গনতন্ত্রের গীতগায়নের ইতিহাস সবারই জানা। অগ্রগমনের পরিবর্তে জাতির উল্টো যাত্রা ডেকে আনে ঘোর দুর্দিন । রাজনৈতিক দেউলিয়াপনার এই সময় পরিধির মধ্যে আত্মঘাতি বোমার সন্ত্রাস সংগঠিত হয়েছে দেশে। বর্তমানকালের এই শংকাজনক পরিস্হিতিতে আমার রণাঙ্গনের সাথীদের অনেক প্রশ্নের উত্তর আজ আমাদের অনেকের জানা নেই। জীবদ্দশায় না হোক যুদ্ধ করার অপরাধে মুক্তিযোদ্ধাদের মরণোত্তর বিচার ও শাস্তি হবে, এ রকম কথার আলোচনা চলছে ইদানিং। সিডনির পত্রিকায় এসেছে 'নিরন্ন মুক্তিযোদ্ধার' সাহায্য সংগ্রহের খবর। ঢাকার নীলক্ষেতে আমি নিজে একজন মুক্তিযোদ্ধাকে ভিখ্খে করতে দেখেছি। অনাহার আর বিনা চিকিৎকায় মুক্তিযোদ্ধাদের মৃত্যু হচ্ছে। তারপর জাতীয় মর্য্যাদায় সমাহিত করার আয়োজন এক বিদ্রুপের মত অসংলগ্ন হয়ে উঠেছে। পত্রিকায় এসেছে কোন এক মুক্তিযোদ্ধার অন্তিম ইচ্ছা: 'জাতীয় মর্য্যাদার' পতাকায় মুড়িয়ে তার শবদেহকে যেন অপমানিত করা না হয়।

এ বিষয়ে একটি ঘটনার কথা বলা প্রয়োজন। একজন নোবেল বিজয়ী ফরাসী কবি এক পানশালায় সহচর বেষ্টিত হয়ে আড্ডা দিচ্ছিলেন। হঠাৎ বাইরে রাজপথে কোলাহল শুনে তিনি জানতে চাইলেন, কি হয়েছে? একজন এসে তাঁকে জানালেন, রাস্তা দিয়ে শোভাযাত্রা করে যাচ্ছেন এক বিজয়ী কুস্তিগীর। তাই পানশালায় সমবেত লোকজন তাঁকে দেখার জন্যে বারান্দায় ভীড় জমাচ্ছে। অন্য আরেকজন বললেন, কি আশ্চর্য 'মঁশিয়ে' তারা আপনার মত গুনী নোবেল বিজয়ী কবিকে ছেড়ে একজন সামান্য কুস্তি গীরকে দেখার জন্যে মেতে উঠেছে। ফরাসী কবি উত্তরে দাঁড়িয়ে বললেন, তারা ঠিকই করছে। ঐ বিজয়ী কুস্তিগীর ফ্রান্সের যৌবনের প্রতীক। চলুন আমাদের সবাইকে গিয়ে তাকে সম্মানিত করা উচিত।

মুক্তিযোদ্ধারা বাংলার অজেয় আত্মা ও যৌবনের প্রতীক। যে অমর জনগণের মধ্য থেকে এই অজেয় সন্তানদের জন্ম তাঁদের এরা গৌরব বৈকি। যে স্বাধীন জাতি গনতন্ত্র চর্চার কথা বলে কিন্তু নিজ বীরত্বের প্রতীককে সম্মানিত করতে ব্যর্থ হয়েছে সে জাতি জাতি হিসেবে সফলকাম হতে ব্যর্থ। আজকের বাংলাদেশ প্রমাণ করে সে কথা। অষ্ট্রেলিয়ায়, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যে ও ইউরোপের দেশগুলিতে ভেটার্নরা কেবল সাধারণ সৈনিক নন, তাঁদের প্রতিবছর সাড়ম্বরে সম্মান দিয়ে একটি জাতি তার বীরত্ব, ঐতিহ্য আর আত্মশক্তির প্রতীকদেরই সম্মানিত করে থাকে। শুধু তাই নয়, এঁরা সামাজিকভাবে অনেক বিশেষ সুযোগ সুবিধার অধিকারী। গৃহ, স্বাস্থ্য,

চিকিৎসা, প্রতিটি ক্ষেত্রে রয়েছে এদের প্রশ্নাতীত অগ্রাধিকার। যদিও এঁরা মহান মুক্তিযুদ্ধ করেনি। করেছে শুধু দেশের সার্বভৌমত্বের রক্ষার যুদ্ধগুলি।

শীতসকালের সোনালী সূর্য্যালোকে ডোমারের মাঠে শিশু কিশোরদের হাতে উড্ডীন লাল সবুজের উজ্জল পতাকার সেই আবেগ আপ্লুত দৃশ্য তবুও আমার বুকের সেই অমর প্রত্যশাকে কোনভাবেই ম্লান হতে দিনে চায়নি। প্রত্যয় ও আশার এখনও স্বপ্ন আছে, আমাদের বিবেক ও সত্যবোধের পুর্নজাগরন হবে। যে কোন জাতির মত বাঙ্গালীর অপরিমেয় ত্যাগও বৃথা যেতে পারে না কোনদিন।

মখদুম আজম মাশরাফী, পার্থ, ৬.১.০৬ইং